প্রাইমারী শিক্ষার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ

6/12/78
513
দৈনিক বাংলা

মোহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম খান

অতীতে ইংরেজ শাসনের শেষের দিকে আমাদের দেশে প্রাইমারী শিক্ষার ওপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপিত হয়। অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষার উপর বিলও উত্থাপিত হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর গোটা শিক্ষা বিভাগে বিশেষ করে প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ নিষ্ঠাবান হিন্দু শিক্ষক সে সময়ে দেশান্তরে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এদের শূন্য পদে অধিষ্ঠিত হন যারা এঁদের অধিকাংশেরই যেমন ছিল না আশানুরূপ যোগ্যতা তেমনি ছিল না নিষ্ঠা। এর ফলে শিক্ষার মান হঠাৎ করে অনেকটা নেমে যায়। পরে জমিদারী প্রথা রহিত হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এমন কি অনেক প্রাইমারী স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাবে অনেক স্কুলের প্রধান আয়ের উৎসও বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি অনেক মুসলমান শিক্ষক শিক্ষকতা ত্যাগ করে শহরে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন।

তদানীন্তন সরকার অবশ্য প্রতিটি থানায় কিছুসংখ্যক সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু শিক্ষকদের বেতন হার অত্যন্ত কম থাকায় মেধাবী ব্যক্তিরা এ পেশা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। যারা শত চেষ্টা করেও একটি নিম্নমানের সরকারী চাকরি পেলেন না, তারাই নিতান্ত দায়ে পড়ে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হলেন। সমাজেও এদের কোন সম্মান ছিল না। প্রাইমারী শিক্ষকদের সবাই নিতান্ত অপদার্থ বলে মনে করতো। অধিকন্তু আগে থেকে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে চাকরীরত বহু অযোগ্য শিক্ষকও সরকারী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ফলে শিক্ষার মান আরও নেমে যায়। শিক্ষকরা শিক্ষাদানকে গৌন কর্তব্য বলে মনে করতে থাকেন। অনেকে ভিন্ন পথে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টায় রত হন। পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রেও দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে অধিকাংশ প্রকাশক ও লেখক ছিলেন হিন্দু এবং কলকাতার বাশিন্দা। হঠাৎ করে '৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিছুসংখ্যক প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ী পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। মৌলিক রচনার বদলে তারা নকল বা অনুকরণে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠলেন। পরে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড সংস্থা। কিন্তু এ সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকের মান অভীষ্ট লক্ষ্যে উন্নীত হলো না। দেশের ভাষা, আদর্শ প্রভৃতি প্রশ্নও সে সময়ে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি করে। প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রদের হজমশক্তির উপর লক্ষ্য না রেখে তাদের উপর নানা ধরনের বিষয় চাপিয়ে দেয়া হয়।

এতো গেল অতীতের কথা, সাবেক পাকিস্তান আমলের কাহিনী। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সরকার গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাঠ্যক্রমের সংক্ষিপ্তকরণ, গণটোকাটুকি, পরীক্ষা কক্ষ পারদর্শকদের উদারতা, শিক্ষকদের উপর হুমকি, আইন-শৃংখলারক্ষাকারী ব্যক্তিদের উদাসীনতা প্রভৃতি কারণে অসংখ্য ছাত্র তখন অবলীলাক্রমে পরীক্ষা বৈতরণী পার হবার সুযোগ লাভ করে। এমন কি বহু আগে লেখাপড়ার পাট ছেড়ে দিয়েছে এমন লোকের মধ্যে হঠাৎ করে পরীক্ষা দেয়ার এবং নতুন করে শিক্ষাজীবন শুরু করার বাসনা সে সময়ে জেগে ওঠে। ফলে হঠাৎ করে দেশে পাস করা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু স্কুল-কলেজ। শিক্ষাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে বহু কলেজে স্নাতক-সম্মান এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা কোর্স চালু করা হল। এতে দেশে উচ্চ ডিগ্রীধারীর সংখ্যাও বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। এদের অনেকে বিভিন্ন কল-কারখানায়, সরকারী অফিসে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সূত্র ধরে ঢুকে পড়লেন। আর যারা পারলেন না, তাদের একটা বিরাট অংশ অগত্যা শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মান তখন আরও নেমে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃংখলার দ্রুত অবনতি ঘটে। অন্য দিকে বাংলাদেশ সরকার সমগ্র প্রাইমারী শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারীতে রূপান্তরিত হন। এই সঙ্গে প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন হারেরও পরিবর্তন করা হয়। তাদের রেশন দেয়ার ব্যবস্থাও নেয়া হয়। কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে অনেক প্রাইমারী স্কুল মেরামত করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের দামও কমানো হয়।

কিন্তু যাদের জন্য এসব করা, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি বা করা হয়নি। গোটা কাঠামোতে তারা গৌন হয়েই রয়ে যায়।

অন্যদিকে প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনার পরিবেশ নেই বলেও অভিযোগ উঠলো। অনেক স্কুলের শিক্ষক সময় মত স্কুলে আসেন না বা এলেও নিষ্ঠার সাথে পড়ান না বা পড়াতে চাইলেও পড়াতে পারেন না বা পারলেও হজম শক্তির অভাবে শিক্ষার্থীরা তা হজম করতে পারে না। এক শ্রেণী কর্মচারীর খেয়ালীপনার জন্য শিক্ষকরা সময়মত বেতন পান না বলেও অভিযোগ শোনা গেল। শিক্ষকদের নিয়োগ ও বদলী নিয়ে নানারকম কারচুপির সংবাদও প্রচারিত হলো। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। প্রকাশনা এবং পরিবেশন নিয়েও নানারকম প্রশ্ন উঠলো।

প্রাইমারী শিক্ষক এ দুরাবস্থার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য কিন্ডার গার্টেন। এই হলো অতীতের কাহিনী। তারপর দেশে ঘটে ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন। প্রাইমারী তথা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অতীতের এরূপ করুণ দৃশ্য লক্ষ্য করে বর্তমান সরকার-এর আমূল পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন, অনেকগুলো শিক্ষা কমিশনও গঠিত হয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং এদেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাগ্রহণ করে সত্যিকারের শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা

পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক ঐসব দেশে শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করা শাস্তিমূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পৃথিবীর বহুদেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাইমারী শিক্ষা অবৈতনিক করা হলেও আজ পর্যন্ত তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। এর ফলে সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও আমাদের দেশে শিক্ষার হার মাত্র ২০%। এদেশের লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকা আজও নিরক্ষতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। অথচ এদের মধ্যে যে নিউটন, আইনস্টাইন, বিটোফেন, গোটে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লুকিয়ে নেই তা কে বলতে পারে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর পিতামাতা এদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণকে বাহুল্য বলে মনে করে। শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ খুব কমই আছে। অনেকে আবার স্কুলে পাঠানোকে সময়ের অপচয় বলে মনে করে। অথচ তাদের অধিকাংশ সন্তানদের দেখা যায় রাস্তায় মার্বেল খেলতে, ঘুড়ি-উড়াতে, মারামারি করতে বা আড্ডা দিতে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের কোন অবদানই নেই। অবশ্য অনেকে শিশুদের বাল্যকাল হতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিতও করে থাকে, বিশেষ করে গরু-ছাগল চড়াতে। মাঠে খাবার নিয়ে যেতে, ঘাস কাটতে, বাজার করতে ইত্যাদি। দেশের অধিকাংশ লোকের এ মানসিকতার আশু পরিবর্তন অপরিহার্য। একটি স্বাধীন দেশের শতকরা আশি ভাগ লোক নিরক্ষর থাকবে এ নিশ্চয়ই কারও কাম্য নয়। তবে এর পরিবর্তনও সহজসাধ্য নয়। আবেদন-নিবেদন বা প্রচারের মাধ্যমে এ সমস্যা সহজে দূর করা যাবে না। এর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এমন কি প্রয়োজনবোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

অনতিবিলম্বে দেশের সকল শিশুদের জন্য প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে আইন প্রণয়ন করা উচিত। অবশ্য প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন এলাকায় নৈশ বা বৈকালিক বিদ্যালয় চালু করতে হবে। এমন কি প্রাথমিক পর্যায় গরীব ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে পুস্তক, স্লেট, পেন্সিল, কাগজ ইত্যাদিও সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। ছাত্রদের জন্য সামান্য টিফিনের ব্যবস্থা করলে সবাই উৎসাহ লাভ করবে। তদুপরি শস্য বপন ও তোলার সময় স্কুল বন্ধ রাখলে অভিভাবকরা শিশুদের স্কুলে প্রেরণকে বোঝা বলে মনে করবে না। আমাদের দেশে নানা পর্ব উপলক্ষে প্রায়ই স্কুল বন্ধ থাকে। গ্রীষ্মকালেও দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ রাখা হয়। এ পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য। অঞ্চল-ভিত্তিক প্রধান শস্য রোপণ ও তোলার সময় স্কুল বন্ধ রাখতে হবে এবং পর্ব উপলক্ষে দেয় বন্ধের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। এর পরও যদি কোন পিতামাতা বা অভিভাবক শিশুদের স্কুলে প্রেরণ না করে, তবে তাদের উপর নিরক্ষরতা কর ধার্য করতে হবে। একই সাথে অন্যান্য ব্যবস্থাও নেয়া যেতে পারে। নিরক্ষর শিশুদের রেশন, ত্রাণ সাহায্য ইত্যাদিও বন্ধ করে দেয়া যায়। এমনকি ঋণ গ্রহণের সময় ঋণ-গ্রহীতার সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, এই মর্মে স্কুলের প্রবীণ শিক্ষকের সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা সম্ভব। নিরক্ষর লোকদের বিবাহের সময় অতিরিক্ত করও ধার্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনরকম উদারতা বা ঔদাস্য প্রদর্শন করা অনুচিত।

যেকোন মহৎ কাজ কার্যকরী করার সময় কিছুটা কঠোর নীতি অবলম্বন করা অপরিহার্য। এর ফলে প্রথম দিকে কিছুটা বাঁধা-বিপত্তির সৃষ্টি হলেও কালক্রমে জনগণ এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে।